মুসলিম চরিত্র

শায়খ মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি
অনুবাদঃ আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য : নৈতিকতার আদর্শমান

সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে

জাকাত হলো বিশুদ্ধতার চাবিকাঠি

তাকওয়া অর্জনের জন্যই রোজা

হজ্ব দুনিয়ার প্রতি মিছে ভালোবাসাকে হ্রাস করে

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিকতার ঘাটতি দুর্বল ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ

কে দরিদ্র

তৃতীয় অধ্যায়

একজন অনুকরনীয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব কেমন হতে পারে

চতুর্থ অধ্যায়

জান্নাতের পথে নাকি জাহান্নামের পথে

প্রথম উদ্দেশ্য- আত্মসংস্কার

প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম

অনাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম

নৈতিকতাই টিকে থাকে

পঞ্চম অধ্যায়

নৈতিক অপরাধের জন্যেও শাস্তি

জোর করে চরিত্র উন্নত করা যায় না

সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে শাস্তি নির্ধারণ

ইসলামের আবেদন একেবারে হৃদয়ের কাছে

সমাজের দায়িত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানবতার মুক্তির জন্য নৈতিকতার কোনো বিকল্প নেই

অমুসলিমদের সাথে আমাদের ব্যবহার

জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা

সপ্তমঅধ্যায়

সত্য ও সত্যবাদিতা

পরামর্শ সবসময় সত্য ও সঠিক হওয়া উচিত

মিথ্যা হলো সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ

আপনার সন্তানকে সততার সাথে চলতে অভ্যস্ত করুন

ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলা যাবেনা

প্রশংসা করার সময় অতিরঞ্জন না করা

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যা ও ছলচাতুরী না করা

কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যাবেনা

সত্য কথা বলাই যথেষ্ট নয়, সত্যবাদিতার সাথে কাজও করতে হবে

অষ্টম অধ্যায়

আস্থা, আমানতদারিতা ও সততা

আমানতদারিতার ব্যপকতর সংজ্ঞা

দায়িত্ব সঠিক ব্যক্তির উপর অর্পন করার নাম আমানতদারিতা

দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করাটাও আমানতদারিতা

ক্ষমতার অপব্যবহার করা আমানতদারিতার স্পষ্ট লংঘন

আল্লাহ যে সম্পত্তি ও যোগ্যতা দেন, সেটার হক আদায় করাও আমানতদারিতা

অন্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করাও আমানতদারিতা

নবম অধ্যায়

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য

সবচেয়ে বড়ো চুক্তি

আনসারদের ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি

অতীত ভুলে যাওয়াও প্রতিশ্রুতি ভংগ করার সমতুল্য
প্রতিশ্রুতি পূর্ন করার মানবতার অপরিহার্য দাবী
ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য
ঋণ পরিশোধ করা খুবই কঠিন

দশম অধ্যায়
একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা
মানুষের আচরন ও কার্যক্রম নির্ভর করে তার নিয়তের উপর
নিয়তের বিশুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন
একাগ্রতা খুবই কাংখিত একটি বৈশিষ্ট্য
একজন গৈণ্যকে তার কাজের মধ্য দিয়েই একাগ্রতার প্রমাণ দিতে হবে
চাকুরীজীবিরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করবে
ছাত্র ও শিক্ষকরাও সব কিছুর আগে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিবে

একাদশ অধ্যায়
কথাবার্তার আদব
কথোপকথোনের কাংখিত পদ্ধতি
আগে নিজের বিচার করুন
নীরব থাকলেই বেশি নিরাপদ
আজেবাজে বিষয় পরিত্যাগ করা সফলতার পূর্বশর্ত
দুরদর্শী হওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো হৃদয়গ্রাহী ভাষণ
যারা অশিক্ষিত নিরবতাই তাদের জন্য যথোপযুক্ত জবাব
বিতর্ক পরিহার করুন

দ্বাদশ অধ্যায়
অন্তরকে হিংসা ও শত্রুতা মুক্ত রাখুন
মহত্বের অন্যতম স্বীকৃতি
পারস্পরিক শত্রুতা থেকে দূরে থাকতে হবে
সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবেনা
হিংসা আর প্রতিহিংসা হলো শয়তানির দুই মূল সুত্রধর

গীবত থেকে দূরে থাকুন
হিংসাপূর্ন বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকুন
হিংসার ধারে কাছেও যাওয়া যাবেনা

ত্রয়োদশ অধ্যায়
শক্তি
ঈমান: একটি বৈপ্লবিক ও উদ্দীপক শক্তি
দৃঢ়তা ও আস্থাই হলো শক্তির প্রকৃত বহি:প্রকাশ
ইসলাম পরগাছা ও তোষামোদকারীদেরকে পছন্দ করেনা

চতুর্দশ অধ্যায়
ধৈর্য্য ও ক্ষমা
ধৈর্য্য ও ক্ষমার অনন্য বৈশিষ্ট্য
ক্ষমা ও ক্ষমাশীলতা
কাউকে পরিহাস করা নোংরামির পরিচয়
অভিশাপ দেওয়া ও গালি দেওয়া হারাম
কঠোরতার উত্তর দিতে হবে নম্রতা দিয়ে
উত্তম উদাহরন

পঞ্চদশ অধ্যায়
মানবপ্রীতি ও দয়া
উদারতা: মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবনের অপরিহার্য অংগ
দারিদ্রতা মানবিক গুনাবলীকে ক্রমশ নষ্ট করে দেয়
দান হলো দুনিয়ায় সফলতা ও আখেরাতে মুক্তির নিশ্চিত উপায়
মানবকল্যান কার্যক্রমে সম্পদ আরও বেড়ে যায়
আপনার সম্পদের প্রথম অংশীদার কে

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
ধৈর্য্য
ধৈর্য্য হলো আলোর বাতিঘর
ধৈর্য্যের দুই স্তম্ভ

লেখক পরিচিতি

শায়খ মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি আহমাদ আল সাকা (১৯১৭-১৯৯৬) ছিলেন একজন বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবীদ। তিনি ১৯১৭ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার নিকলা আল ইনাব নামক ছোট্ট একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। কর্মজীবনে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলজেরিয়ার আব্দ আল কাদির বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তিনি দীর্ঘদিন ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট (আইআইআইটি) এর কায়রো শাখার একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৬ সালে ৭৮ বছর বয়সে কায়রোতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর পর তৎকালীন সৌদি যুবরাজ আব্দুল্লাহ বিশেষ একটি বিমানে করে তার লাশ নিয়ে যান এবং সেখানেই পবিত্র মদিনায় তাকে দাফন করা হয়।

শৈশব থেকেই ইসলাম বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্যের লক্ষণ ফুটে ওঠায় তার বাবা বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক গাজ্জালির নামানুসারেই তার নামকরণ করেন। মোহাম্মাদ বিন গাজ্জালি যখন বড়ো হচ্ছিলেন তখন গোটা মিশর ঔপনিবেসিকতার পদতলে পিষ্ট হয়ে খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিল। তার বাবা স্বপ্ন দেখছিলেন– এই সন্তান বড়ো হয়ে ইসলামের জন্য এমন কিছু ভূমিকা রাখবে এবং ইসলামকে যৌক্তিকভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে, যার মাধ্যমে নতুন করে ইসলামের পুনর্জাগরনের একটি পথ তৈরি হয়। বাবার সেই স্বপ্ন পূরন করেছিলেন তিনি। মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি তার জীবদ্দশায় এমন কিছু বই লিখে গিয়েছেন, যা ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ করে দেয়। রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে ইসলামের চিরন্তন শিক্ষা জনজীবন থেকে মুছে দিয়েছিল, সেটাকেও তিনি অনেকটাই ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

ছাত্র হিসেবে মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি তার শৈশবেই কুরআনের হাফেজ হন। এরপর তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উপর ব্যপক পড়াশুনা করেন। ফলে সমসাময়িকদের মধ্যে আরবি ভাষায় তার মতো দক্ষ আর কাউকে পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে আল আজহারে উসুল-উদ-দীনে পড়ার সময়ও তিনি তার মেধার সাক্ষর রাখেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় যখন তিনি অধ্যয়ন করছিলেন, তখনই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্নার সান্নিধ্যে আসেন। মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি যতদিন জীবিত ছিলেন, তাকে যখনই প্রশ্ন করা হতো যে আপনার জীবন ও কর্মে কার প্রভাব সবচেয়ে বেশি? তিনি অবলীলায় হাসান আল বান্নার নামই বারবার উচ্চারন করতেন।

হাসান আল বান্নার ভাষণ ও দর্শনকে তিনি সকলের কাছে পরিচিত করতে ভূমিকা পালন করেন। মোহাম্মাদ আল গাজ্জালি মূলত হাসান আল বান্নার সাথে দেখা করার পরই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য হিসেবে যোগ দেন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাকালীন কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চিন্তক ছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় ও জার্নালে লেখালেখি করতেন এবং তাকেই ইখওয়ানের মূল লেখকদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীকে তার লেখনির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেন।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের যুদ্ধে অংশ নেওয়ার অপরাধে মিশর সরকার মোহাম্মাদ আল গাজ্জালিকে গ্রেফতার করে। কারাগারে গিয়েও তিনি কারাবন্দী মানুষের মধ্যে ইসলামের বিষয়ে ধারনা পরিস্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি জেলখানার ভেতরেই স্টাডি সার্কেল করতেন, জামায়াতে সালাত পড়াতেন। কারাবন্দী সকলের জীবনটাকে ভালো কিছু কাজ করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। কারাগারেও তিনি সত্য প্রকাশে ছিলেন আপোষহীন। তিনি দেখছিলেন বন্দীদের জন্য বরাদ্দ করা খাবারগুলো কীভাবে কারা প্রশাসন চুরি করে নিচ্ছে। তাছাড়া আইনশৃংখলা বাহিনীও স্বেচ্ছাচারিতার সাথেই সব কাজ করার চেষ্টা করছে। তাই জুমার সালাতের খুতবায় তিনি প্রশাসনের এসব দূর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত বক্তব্য দেন। কারা প্রশাসন তাকে থামানোর নানা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে সেই সব অনাচার বন্ধ করতে বাধ্য হয়।

লেখক হিসেবে তিনি মোট ৯৪টি বই লিখেছেন। তার রচনাবলী মিসরের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে ব্যাপকভাবে উজ্জীবিত করেছে। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহকে তরুণদের সামনে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেন। তাকে মিসরের ইসলামের উত্থানের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের ভিত্তি এবং নৈতিক মূল্যবোধ

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য : নৈতিকতার আদর্শমান

মানবতার মুক্তিদূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে অন্ধকারের পথ থেকে সরিয়ে আবারও আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য, মানুষের মনগড়া সব তত্ত্ব আর কাল্পনিক দর্শনের উপরে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র আল কুরআনের সুরা আহযাবের ৪৫ নং আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> 'হে নবি! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।'

এ কথা শুধু মুসলমান নয়, সারা পৃথিবীর সকল ধর্ম ও গোত্রের মানুষ স্বীকার করে– শুধু আল্লাহর নবি হিসেবে নয়, নবিজির গোটা জীবনটাই হচ্ছে মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ। কেউ যদি নিজেকে স্বস্তি দিতে চায়, জীবনে সুখ ও সফলতা অর্জন করতে চায়, তাহলে তার জন্য রাসূল (সা.)-এর আদর্শ ও ব্যক্তিজীবন অনুসরণ করার কোনো বিকল্প নেই।

সুরা আহযাবের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

> 'যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ।'

অন্যদিকে প্রিয়নবি (সা.) এই পৃথিবীতে তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন,

> 'আমাকে পাঠানো হয়েছে কেবলমাত্র নৈতিকতা এবং সদাচরণকে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করার জন্যই। (আল মুয়াত্তা)

এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে চেতনার কথা বলেছেন, সে চেতনা মানবতার ইতিহাসে একটি অনুপম ও অলঙ্ঘনীয় বার্তা হিসেবে সবসময়ই বিবেচিত হয়ে এসেছে। একই সাথে আল্লাহর রাসূলের (সা.) দেখানো পথের অনুসরণকারীরাও চিরদিনই এই চেতনাকে সামনে রেখেই জীবন চলার পথে অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছে।

উপরোক্ত হাদিসের দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (সা.) এই পৃথিবীতে আসার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষের নৈতিক চরিত্রকে মজবুত করা। সৌন্দর্য ও পরিপূর্নতার বৈশিষ্ট্যগুলো মানুষ সহজেই যেন অনুধাবন করতে পারে। নিজেদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেন তারা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন ও ধারণ করতে পারে।

ইসলামে বেশ কিছু ইবাদাতকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বেশ কিছু মৌলিক ইবাদাতকে ইসলামের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের এ মৌলিক ইবাদাতগুলো শুধুমাত্র এমন নয় যে, তা কোনো অজানা-অচেনা শক্তির সাথে মানুষের সম্পর্ক তৈরি করবে। আমাদের দ্বীনের কোনো ইবাদাত অহেতুক বা নিছক কোনো ধর্মীয় আচারাদি নয়; বরং সকল বাধ্যতামূলক ইবাদাত বান্দাকে সত্যিকারের নৈতিকতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ন্যায়পরায়নতার সাথে বেঁচে থাকতে প্রশিক্ষণ দেয়। ইসলামের স্পষ্ট বার্তা– মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষের এমন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত, যেন তার নৈতিকতা উত্তোরোত্তর সুন্দর ও পরিশীলিত হয়। জীবনে ভালো-মন্দ, সুখ বা বিপর্যয় আসতেই পারে; তবে কোনো অবস্থাতেই নৈতিক অবস্থান থেকে সরে আসার কোনো সুযোগ নেই। এটা ইসলামের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা।

সালাত মানুষকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে

সালাত ইসলামের একটি মৌলিক ও বাধ্যতামূলক ইবাদাত। সালাত এমন একটি সুন্দর আমল, যা মানুষকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণ ও আকৃষ্ট করে। কোনো মানুষ যদি নিয়মিত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জীবনধারা সব ধরনের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পায়। পাশাপাশি তার শারীরিক অবস্থাও অনেক ভালো থাকে। পবিত্র কুরআন ও রাসূলের (সা.) জীবনাদর্শ বারবার এই বাস্তবতাই প্রমাণ করেছে। যখন আল্লাহ সালাতকে বাধ্যতামূলক ইবাদাত হিসেবে ঘোষনা করেন, তখন সালাতের উপকারিতা ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কুরআনে বলেন, 'নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে সব ধরনের অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে।' প্রকৃতার্থেই সালাত হলো এমন একটি ইবাদাত, যা পাপাচার থেকে দূরে রাখে, অশ্লীলতার হাত থেকে সুরক্ষা দিয়ে শরীর ও মনকে বিশুদ্ধ রাখে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি হাদিসে কুদসি না উল্লেখ করলেই নয়। যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

> 'আমি কেবল তারই ইবাদাত কবুল করি, যে নম্রতার চর্চা করে, আমার প্রতি শোকরগুজারি হয়। আমার প্রতিটি সৃষ্টি আর প্রতিটি নিয়ামাতকে মুল্যায়ন করে, আমার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় না, সারাটা দিন আমার স্মরণেই কাটায় এবং গরিব-দু:খী, মুসাফির, মজলুম এবং অবহেলিত মানুষদের প্রতি দয়া করে।'

জাকাত হলো বিশুদ্ধতার চাবিকাঠি

নিসাব পরিমান সম্পত্তি আছে– এমন স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্যই জাকাত আদায় করা ফরজ। জাকাত এমন কোনো কর ব্যবস্থা নয়, যা মানুষের পকেট কেটে আদায় করা হয়। জাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো দয়া, মানবিক সহানুভূতি এবং পরোপকারের মানসিকতা সৃষ্টি করা। একই সাথে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ন অবস্থান তৈরি করা। মানুষকে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করাও জাকাত আদায়ের লক্ষ্য। জাকাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে সুরা আত তাওবার ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

> 'তাদের সম্পত্তি থেকে জাকাত আদায় করা হয়, যেন এই সম্পত্তিগুলো পবিত্র ও বরকতময় হয় এবং পাশাপাশি এই আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন মানুষগুলোও যেন সম্পূর্নরূপে পবিত্র হয়ে যায়।'

জাকাত আদায়ের লক্ষ্য হলো নিজেকে দুনিয়াবি পাপাচার থেকে মুক্ত রাখা এবং একই সাথে সমাজে শালীনতা ও বিশুদ্ধতার চর্চা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে গোটা সামাজিক পরিস্থিতির মান উন্নয়ন করা। সে কারণেই প্রিয়নবি (সা.) জাকাতকে অনেক ব্যপক একটি ইবাদাত হিসেবে গণ্য করতেন এবং আর এ কারণেই সকল সামর্থবান মুসলমানের জন্যই জাকাতকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে।

> 'দান বা সাদাকা গুনাহ মিটিয়ে ফেলে, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে।' (সহিহুল জামে–৫১৩৬)

কাউকে কিছু দান করার গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

> 'কারও মুখে হাসি ফোটানো সাদাকা। ভালো কাজ করা এবং অন্যকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখাও সাদাকা। রাস্তায় অন্য কোনো পথচারীর সমস্যা হতে পারে এ আশংকায় সড়ক থেকে হাড়, কাঁটা বা বিপদজনক কিছু দেখে তা অন্যত্র সরিয়ে ফেলাটাও সাদাকা। কোনো তৃষ্ণার্ত মানুষকে পানি পান করানোটাও সাদাকা। এমনকি যদি কাউকে তার গন্তব্যে পৌঁছতে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়, তাহলে সেটাও সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে।' (বুখারী)

রাসূল (সা.) যে যুগে যে মরুভূমির দেশে রাসূল (সা.) হিসেবে আবির্ভূত হন, সে সময়ের মানুষের সংস্কৃতি ছিল সংঘাতের সংস্কৃতি। বিশেষ করে বেদুঈন এবং মরুভূমিতে বসবাসরত অন্যান্য গোত্রগুলো সবসময়ই নিজেদের মধ্যে নানা ইস্যুতে দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকত। ঠিক সেই সময়ে ইসলামের পবিত্র আহবান নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাজির হন। আর তারপর রচিত হলো এক নতুন ইতিহাস। গোটা বিশ্ব সেই ইতিহাস জানে। কীভাবে আইয়ামে জাহেলিয়াতের গতিধারাকে ইসলামের আলোকবর্তিকার স্পর্শে আমূল পাল্টে দেওয়া হয়েছিল। অন্ধকারে পড়ে থাকা সেই আরবেরাই কীভাবে কালজয়ী আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছিল।

তাকওয়া অর্জনের জন্যই রোজা

ইসলাম রোজা রাখাকেও বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু রোজা রাখার মানে এটাও নয় যে মানুষ তার পার্থিব চাহিদা বা জাগতিক বাসনা থেকে কেবলমাত্র দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় বিরত রাখবে। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবি (সা.) বলেন,

> 'রোজা রাখার মানে শুধুমাত্র খাওয়া বা পানাহার থেকে বিরত রাখা নয়; বরং এর পাশাপাশি সব ধরনের নোংরা, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখা। যদি রোজা রাখা অবস্থায় কেউ আপনাকে কোনো খারাপ কথা বলে বা গালি দেয়, তাহলে আপনি তাকে বলে দিন যে, আমি রোজা আছি।' (রেফারেন্স যুক্ত করতে হবে)

রোজা রাখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

> 'তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনটি করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সুরা আল বাকারা-১৮৩)

হজ্ব দুনিয়ার প্রতি মিছে ভালোবাসাকে হ্রাস করে

অনেক সময় যারা সামর্থবান তারা মনের স্বস্তি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পূণ্যভূমিতে তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু হজ্ব তেমন কোনো ইবাদাত নয়। ইসলামে সামর্থবান মুসলমানদের জন্য হজ্বকে ফরজ করা হয়েছে। ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হজ্ব। অনেকেই মনে করেন হজ্বের সাথে নৈতিকতা ও চরিত্র উন্নয়নের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা সম্পুর্ন ভুল ধারনা। হজ্বের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

> 'হজ্বের মাসটি সর্বজনবিদিত। এ মাসে যে লোক হজ্বের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হওয়াও জায়েজ নয়। পাশাপাশি অশোভন কোনো কাজ করা বা কারও সাথে ঝগড়া-বিবাদ করাও হজ্বের সময় জায়েজ নয়। আর এ সময়ে তোমরা যে ভালো কাজগুলো করবে, আল্লাহ সেই সেগুলো জানবেন। তোমরা সেভাবেই তোমাদের পাথেয়গুলোকে সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার মাঝে কোনো পাপ নেই। (সুরা আল বাকারা: আয়াত ১৯৭)

এ পর্যন্ত আমরা কেবলমাত্র ইসলামের কিছু মৌলিক ইবাদাত বা মুল স্তম্ভগুলোর প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। এই ইবাদাতগুলোর সামান্য কিছু বিবরণ আমাদেরকে এ সম্যক ধারনাই দিলো যে ধর্মের এই আচারাদিগুলোর সাথে নৈতিকতার সম্পর্কটি কতটা মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী।

উপরোক্ত ইবাদাতগুলো ধরনের দিক থেকে একটি অপরটির থেকে অনেকটাই ভিন্ন; কিন্তু উদ্দেশ্যের জায়গায় এসে আবার ততটাই সাদৃশ্যপূর্ন। আর সেই উদ্দেশ্যটি হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য; যেটা লেখার শুরুতেই বলেছিলাম– সমাজে নৈতিকতা এবং সদাচরণকে প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করা।

এ কারণেই সালাত, রোজা, জাকাত, হজ্ব কিংবা ইসলামের সকল ইবাদাতই পরিপূর্নতা অর্জনের পথের একেকটি ধাপ। এই ইবাদাতগুলো মানুষকে পরিচ্ছন্ন করে, বিশুদ্ধ করে, জীবনকেও নিরাপদ ও সুন্দর করে তোলে। ইসলামের কোনো ইবাদাত বা ধর্মীয় আচারাদিকেই নৈতিকতার চেতনা থেকে আলাদা করার সুযোগ নেই। ইসলামে নৈতিকতাকে বরাবরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

> হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল একবার বিদেশ ভ্রমনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি রাসূল (সা.)কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে কিছু উপদেশ দিন। রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহর আনুগত্য কর। তার সাথে কাউকে শরীক করোনা। আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো। প্রত্যেক গাছের নিকট, প্রত্যেক পাথরের নিকট অর্থাৎ সর্বত্রই আল্লাহকে স্মরন করো। যখনই কোনো অন্যায় করবে তৎক্ষনাৎ কিছু না কিছু ভালো কাজ করো। আর সেই সাথে তোমার স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহার যেন ভালো হয়ে যায়। (ইবনে হাব্বান, হাকিম এবং তিবরানি)

আর যদি ইবাদাতগুলো কোনো মানুষের অন্তরকে বিশুদ্ধ করতে না পারে, যদি এ ইবাদাতগুলো মানুষের ভেতরকার উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোকে বের করে আনতে না পারে, কিংবা এ ইবাদাতগুলো পালন করার পরও যদি আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার সম্পর্কটি সুদৃঢ় না হয়, তাহলে সেই হতভাগা ব্যক্তির জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

পবিত্র কুরআনে সুরা তোয়াহার ৭৪-৭৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাই বলিষ্ঠভাবে ঘোষনা করেছেন যে,

> ‘নিশ্চয়ই যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে এমন সৎ কর্মশীল ঈমানদার হয়ে হাজির হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। তাদের বসবাসের জন্য এমন বাগান রয়েছে যার তলদেশে দিয়ে ঝর্না প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।’